কমলকুমার মজুমদারের ছবি

শানু লাহিড়ী

আঁকা সম্পর্কে আমাকে লিখতে হবে। কেন না আমি তার ছোট বোন! দাদা বেঁচে থাকলে বলতো, তুই আবার এ সব কি লিখছিস -- যাঃ বাদ দে। সত্যি কথাই তো আমি কি লিখবো। প্রখ্যাত চিত্র - শিল্পী পরিতোষ সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী ও আরও অনেকে দাদার ছবি নিয়ে লিখেছেন। আসলে আমি দুই দাদাকে একসঙ্গেই দেখেছি। উঠা, বসা চলাফেরা সব একসঙ্গে। একজনের কথা লিখতে গেলে আর একজনের কথা এসে পড়বেই। একজন লিখতেন আর একজন ছবি আঁকতেন।

আমাদের ছোটবেলায় পাড়ার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতো, তোর দাদারা কি কবি? লম্বা লম্বা পাঞ্জাবী পরে লপেটা চটি পায় -- খালি আসে আর যায়? দাদাদের এ কথা বল্লে হো হো করে হাসতো সঙ্গে আমরাও । আমরা তখনথাকি রাজা সীতার াম রোডে। পাড়া দিয়ে একজন রোগা ক্ষয়া মত লোক বাংলা বই বিত্রি করতেন। বিস্তর পাতলা পাতলা চটি বই দাম ২/১ আনা। তিনি খুব জোর গলায় বলতে বলতে যেতেন নারী প্রগতি বাংলা দেশ - এ পোড়া বাংলা দেশ ইত্যাদি। দাদারা তঁ ার গলার আওয়াজ পেলেই তাঁকে ডেকে বই দুএকটা কিনতো আর হেসে মরে যেত।মাঝেমাঝে একটা বই দেখে দাদা নান া জিনিস তৈরি করতো। কখনও কাপড় কাচা নয়তো গায়ে মাখা সুগন্ধি সাবান আবার কখনও আইসক্রিম নয় তো ফিন াইল। অদ্ভুত ধরনের রান্নার কথাও শুনতাম -- মাংসের গোপ চোপ, পদ্মিনী কাবাব নয় তো ডিমের ডেভিল। বইটার নাম ছিল হাজার জিনিষ। আরও দু একটা বই ছিল নাম মনে নেই।

১১৭ রাসবিহারি এভিনিউতে (সিডলি হাউসে) যখন থাকতাম তখন দাদা প্রচুর পোড়া মাটির পুতুল সংগ্রহ করতো। এর অভ্যাস বহু দিনের ছিল, দুই দাদাই করতো. তবে এই বাড়িতে জায়গা ছিল অনেক বলে রাখার সুবিধে হয়েছিল, তাই সংগ্রহ ক্রমে বেড়ে গেল। আমিও রথ ও চড়কের মেলা থেকে নানা ধরনের পুতুল কিনতাম। দাদাযখন যেখানে যেত -- বঁ াকুড়া, বিষ্ণুপুর, ডায়মণ্ড হারবার, মেদিনীপুর সব জায়গা থেকে পোড়া মাটির পুতুল আনতো। প্রত্যেকটি মাটির পুতুলের কী মাটি দিয়ে তৈরি -- তার ফর্ম, কার কি বিশেষত্ব সব নখদর্পনে। দেশ বিদেশের লোকশিল্পের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। স্বভাবতই এই সব নিয়ে পড়াশুনাও করতো। সারা পৃথিবীর ছবি নিয়ে তাদের ইতিহাস, প্রচলিত ছোট গল্প -- কোনোটা বাদ যেত না। দাণ লাগতে শুনতে।

প্রায় শদেড়েক পুতুল দাদার - সেগুলো ছিল দাদার - সেগুলো নিয়ে আমি কোপেন হেগেন মহাদিবসে (১৯৫৪) প্রদর্শনী করেছিলাম।

নানা ধরনের আলোচনা হত। দাদা বললো, চাঁদের আলোর রং কি ? বললাম -- গাঢ় নীল আর একটু কাল মিশিয়ে হাল্ক া করে। বললো, না ওটা সবুজ। অল্প নীল মেশান যায়। মানতে রাজি নই। দাদা বোঝালো-- সাধারণত যে সব রং আমরা দেখি তার মধ্যে অনেক কিছু রং মেশান থাকে। যখন সাদা দেওয়াল আঁকিস তখন কি শুধু রং দিস, না তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু রং অল্প বিস্তর মিশিয়ে করিস। এও ঠিক তাই। তুই দেখ সেঁজানের ছবি আর অন্যান্য আর সকলের ছবি। সব দেখবি নানা রং মিশিয়ে বিশেষ একটা রং বোঝার চেষ্টা করছে। জিনিসটার ঘনত্ব, ভারিত্ব, তার ঔজ্জ্বল্য-ভাব - উত্তপ্ত সব আনার চেষ্টা। একদিন একটা বিরাট বই নিয়ে এলো, ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পীদেরনিয়ে তাদের সম্পর্কে নানা গল্প লিখেছেন অঁ াব্রোয়াজ ভোলার্ড। প্রচুর শিল্পীদের জীবন - কাহিনী ও গল্প সব -- এইধরনের নানা আলোচনা করত। এক সময় আমার

art School-এর তিন বন্ধুতে মিলে একটা studio করেছিলাম --- ডায়োসিয়েসন স্কুলের হোস্টেলের ঘরে। art school-এ তখন model দিতো না তাই আমরা প্যারিসের স্টুডিওর মত করে কাজ করতে চাইলাম। ছবিগুলো বাড়ি আনলে দাদা মাঝে মাঝেদেখতে চাইতো কি করেছি। দাদা একদিন হরিসাধন দাশগুপ্তকে দেখায় এবং আমাদের ছবি সম্পর্কে আলোচন া করে। এ কথা - বহুদিন বাদে আমি জানতে পারি। একদিন হরিসাধনবাবু ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের ল্যান্সডাউন কোর্টের বাড়ি আসেন। নানা গল্পের মধ্যে আলোচনা হতে হতে এই গল্পটা বলেন। অনেক দিন বাদে শুনলাম, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে দাদা ঐ ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখতো।

একদিন দাদা বললে, আচ্ছা বলতো আমাদের - শিল্পীদের ছবিগুলো কি করে এতো কাদা কাদা দেখতে হয়। প্রত্যেকটা চিত্র - প্রদর্শনীতে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখতো। চিত্র - সমালোচনাও করেছিল অনেকবার। আমার ড্রপ্রড়নন্ত্বদ্ধনঙ্ক-এ দাদা আসতো এবং আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকতাম। আমি মানতাম যা বলবে সেটাই আমার সবয়েচে বড় সমালোচনা হবে। দুই একটা কথাই বলতো, আমি বুঝতাম কি বলতে চায় -- আর কিছু প্রয়োজন হত না। আমাদের Exhibition-এর সমালোচনা কখনও করেনি!

হঠাৎ বললো মানুষের best position কি বলতো? বলেই --- ধপাস করে খাটে শুয়ে পড়লো --- আঃ কি আরাম। বললো -- এটাই। শুয়ে পড়ে একটা খাতা টেনে স্কেচ করতে আরম্ভ করলো।

১৯৪৬/৪৭ সালে নিদা প্যারিস চলে যায়-- দাদা একটু সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে, সেই সময় থেকেই প্রচুর নক্সা - ড্রাইং ইত্যাদি করতো. বালিশ বুকে করে বই পড়তো আর নয় তো লিখতো। নয় তো স্কেচ। তখনকার স্কেচগুলো শুধু চেষ্টাই চলতো ত ারপর দেখি ছোট বর্ডার দেড় ইঞ্চি মাপমত অসংখ্য ছবি তৈরী হচ্ছে। বুঝতে পারতাম মনে মনে একটা বড় রকমের ধারণা নিয়ে কাজ হচ্ছে। প্রত্যেকটার নম্বর করা। মনে হত কোন ছবি তোলার আগে কম্পোজিসনের ভাবনাগুলো এক সঙ্গে ধরে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। দু একটা স্কেচ আজকাল (২১ শে জুন ১৯৮৫) পত্রিকায় প্রকাশিত। দাদা মারা যাবার পর সত্যজিৎ রায়ের লেখায় স্কেচের কিছু উল্লেখ আছে।

নানা জিনিস নিয়ে ড্রইং করেছে--পশু পাখী গাছপালা, কাজে মানুষ মহিলারা রাস্তায় স্নান করছে। সব ড্রইংও স্কেচ এক সঙ্গে বসে দেখলে তাদের সুন্দর ত্রম বিকাশের ধারা ধরা যায়।

পরবর্তীকালে যখন রং দিয়ে ছবি আঁকতে সু করে ড্রইং স্কেচ বাদ দিয়ে, সে সব ছবি অবাক করেছে সকলকে। কবে থেকে দ াদা ছবি আঁকা সু করলো-- আর একেবারে পাকা হাতের কাজ! সখ করে ছবি আঁকছে তা নয়,পুরোপুরি শিল্পী - মনোভ াব নিয়ে। সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে কাজ করা কোথাও কোন অবয়বে চারি পাশ ঘিরে হাল্কা রং দেওয়া ও প্রয়োজনে ব্রাস দিয়ে রং ছিটানো। স্নিগ্ধতায় ভরা। একদিন দাদা জিজ্ঞেস করলো দেখতো এই ছবিগুলো দিয়ে Exhibition করা যায় কি না? বল্লাম, অপূর্ব ছবি নিশ্চয়ই হবে।

দাদার লেখা পাঠোদ্ধার করা শক্ত। পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে খানিকটা মুখস্তহয়ে গেলে (তাও ভারি শক্ত আমাদের ক াছে) তারপর আবার পড়ো। এক পাতা ১০ বার পড়লে একটা রূপ অর্থাৎ শব্দ থেকে বর্ণে বা রূপে চলে আসা রূপ ধর ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আগের লাইনে ফিরে আসা। এবং সর্বশেষে সব গোলমাল হয়ে যাওয়া।কিন্তু পড়ার পর একটা নেশা ধরিয়ে দেয়। পড়ার নেশা। শব্দ বর্ণ রূপের নেশা-- ঘুরে পথের নেশা একবার পৌঁছালো, পড়ার পথ অনেক সরল - তবু মোড় ঘুরলেই সাংঘাতিক ঘূর্ণিপাক -- দাদার লেখার সঙ্গে ছবি কোথায় একটা যোগ আছে। শব্দ সমষ্টির কি রূপ! ছবিতে অবয়বের আশে পাশে ছোট অসংখ্য লাইন, কোথায় আবার লাইনই নেই--আছে শুধু হাল্কা রং এর আভা -- মুখের মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু চোখ। চোখের সু থেকে শেষ পর্য্যন্ত মোটা স লাইনে ভাব প্রকাশ করেছে। মুখের সুডোল চেহ ারায় শেষ করেছে। নানা ধরনের বিষয় বস্তু বিচিত্র ভাবনা সৃষ্টি করে। লেখার ভাষার সঙ্গে ছবির ভাবের মোচড় থাকে বলে টুইষ্ট অতি বিচিত্র। ছবিতে মানুষ তার হাত পা - জলবর্ণ পশু পাখী অনেক উপলব্ধির ধারণা দেয়। যে ভক্তি- রস লেখ ার আরম্ভ ও শেষে দেখা যায়, ছবিতেও সেই ভক্তিরস ভরে থাকে বিশেষ করে রঙ্গিন ছবিগুলোতে। ছবির উপর নক্সা করা অথবা লেখা মনোমুগ্ধকর। তারই পাশে বিন্দু বিন্দু রংছিটোনো অভিনব। দাদা কালিঘাটের পটচিত্র ভীষণ ভালবাসতো--- পটচিত্রের লাইন দিয়ে অনেক Sketch করেছে। একটা লেখাতে বলছে -- কালিঘাটের ছবি দেখলে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়। সত্যিই অবাক হতে হয় কি করে এই শিল্পীরা এমন ব্যঞ্জনা এনেছেন তার সঙ্গে বেশ জোরাল লাইনও। সর্বদা কার্ভ ল

াইনের পাশ দিয়ে সোজা সরলরেখা বাধ্য করা। কার্ভ লাইন আর সরলরেখা অপ্রত্যাশিতভাবে বৈপরিত্যের দরজা খুলে দিয়েছে। অথচ কত সুন্দর কত সহজ অবিশ্বাস্যভাবে কালিঘাট তার রেখা আর হাল্কা রং, কালো রং-এর হাল্কা সেড নিয়ে স ামনে এসে দাঁড়ায়। এসব লাইনটানা তো উদ্দেশ্যবিহীন নয়-- কালিঘাটের বিশেষত্ব। দাদার ছবিতে এ ধরনের রেখার অবতারণা করা হয়েছে। ফর্ম ও কম্পোজিসনের দাণ জ্ঞান ছিল সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্টেরও। রসবোধ অভাবনীয়। ছবিগুলো মন দিয়ে দেখালে হঠাৎ আবিস্কার বলেই মনে হয়। কোন কোন ছবিতে একটা অল্প হিউমার আছে। রসবোধেব অনুভূতি। গভীর কোন ভাবময় ছবি এঁকেছে যেমন একটা ছবিশ্মশানের কি --- পূজোর কাছাকাছি কোন জায়গায় একটা কুকুর জিভ বার করে যাচ্ছে অথবা শুঁকছে, দেখলে চমক লাগে। একটা গু গম্ভীর ভাবের মধ্যে এ জিনিষ। বিরাট স্থিতির মধ্যে একটা ত াৎক্ষণিকের ভাব। শিল্পী পরিতোষ সেন একটা জায়গায় বলেছেন, কমলবাবু সর্বদাই ছোট ছবি এঁকেছেন কিন্তু ছোট ছবিগুলি সংবেদনশীলতায় ভরপুর।

চটের কি কাপড়ের থলে করে ছোট ছোট কাঠের টুকরো এবং কিছু বুলি নিয়ে ঘুরতো। যখন যেখানে পারতো বসে বসে ক াঠ খোদাই করতো আর গল্প করতো। আমাদের ছোটবেলায় দাদাদের একটা পত্রিকা ছিল। নাম ছিল উষ্ণীষ। হাতে ছাপ া, তাতে অনেক কাঠখোদাই ছিল, তা কিছু নিদার ও ওদের বন্ধু নরেন মল্লিকের। দাদা তখনস্কেচ বা ড্রইং ছবি কিছুই করতে া না। শুধু শিখতো। বহুদিন বাদে দাদা কাট খোদাই আরম্ভ করে। যে দেখবে-- ছবি,কাঠখোদাই অবাক হবে। কি অসাধারণ কাঠখোদাই না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সচরাচর কাঠখোদাই যা দেখিএকটু মোটা ধরনের কাটা-- তাই দেখেই অভ্যস্ত। দাদার এতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাটা বিভিন্ন ধরনের---যখন যেমন করেছে---বনজঙ্গল জল, মানুষ ইত্যাদি -- প্রত্যেক ক াঠখোদাইতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি এনেছে। জল-মনে হয় নড়ছে খেলছে, বনের ডালপালার এলোমেলো ভাব ধরার চেষ্ট া রয়েছে। -- অথচ মোটেই বাস্তবধর্মী নয়।

দাদা মারা যাবার পর যে সব কাঠখোদাই সূক্ষ্ম কাজ দেখেছি তা সবই ইন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে। Exhibition-এ ছিল। তাতে নানা ধরনের কাঠখোদাই ছিল। অতি উচচাঙ্গের কাজ। জাঁ কোকতোর লেখা লেজাঁকাঁ টেরিবলে বইতে শিল্পীর গুরি দোইয়া ৩২ টি কাঠখোদাই -এর কাজ অসাধারণ এবং মার্শাল প্রেভেরি লেকা জাঁ মেয়ত্রিস এ মোয়ার বইতে একজন শিল্পীর ৩৪টি কাঠখোদাই আছে---বহু পুরোন বই -- অপূর্ব এবং মুগ্ধকর --- দাদার কাঠ খোদ াই দেখতে এই কথা মনে করিয়ে দেয় --- আমার বিশ্বাস এই সব কাঠখোদাই চিত্রশালায় সংরক্ষণের দাবীরাখে। উড়িষ্যার নীশা পার্বতী যিনি দেখেছেন--- তিনি জানেন বিরাট কালো পাথরের ভাস্কর্যের উপরে বেনারশী শাড়ীর যে নকশা খোদাই করা তা এত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যে ভাবা যায় না। কোমলতায় ভরা। দাদার কাঠখোদাই এসব কথা মনে করিয়ে দেয়। ছড়ার বইতে খোদাই ছাপা তার চেয়ে Exhibition-এর ছবি অনেক অংশ উচচাঙ্গের বলে মনে হয়। ছোট ছোট ৪/৫ ইঞ্চি কাঠের মধ্যে কত ধরনের বুলি ব্যবহার করেছে, কখনও নন, ছুরি কিছু বাদ নেই। এ সব কাজগুলো এচিং -এর পর্য্যায় পড়ে। গবেষণার বস্তু। নানা ধরনের কাজ , ছোট ছোট ভাঙা রোগা ঢেউ খেলানো চুল সুন্দর ও চমকপ্রদ। মনে হয় কমল মজুমদার কাঠখোদাই -এর শেষ কথা।

সারা জীবন ধরে এক একজন লোক কিছু যেন খুঁজেছে--- কি যেন চেয়েছে -- অল্প বয়সে দাদার লেখা নাটক হতো ১লা বৈশাখে। ভাই বোন, পাড়ার কয়েকজন বন্ধুরা মিলে অভিনয় করতো। তারপর পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে--- স্কেচ ড্রইং ছবি আঁকা কাঠখোদাই চললো--- নানা জিনিস সংগ্রহ করার অভ্যাস ছিল --- সবচেয়ে আশর্চ্য দাদা ব্যবসায় নেমে ছিল -- খুব কম সময়ের জন্য। প্রচুর টাকাও করেছিল, পুরোদমে সাহেব কমল মজুমদার ছিল। ....কিন্তু একদিনেই ছেড়ে দিল। পুরোপুরি বাঙ্গালী -- তারপর বার করে খেলার প্রতিভা, অঙ্কভাবনা --- তদন্ত ইত্যাদি।

প্রত্যেক লেখক - শিল্পী সংস্কৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সংগীতের সংগে নিকট আত্মীয়তায় জড়িত -- তাইখুব সহজেই কেউ চায় ছবি আঁকতে, কেউ বাঁশী বাজান আর কেউবা ভাইওলিন.... Creativity তো থেমে থাকতে জানে না, যে যখন অবক াশ পান ধরেন অন্য সুর -- দাদা পুরেপুরি একজন creativeমানুষ--- তাই থেমে থাকেনি কোন দিনও।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com